সুন্দর ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায়ঃ মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে সচেতন হওয়া প্রয়োজন

আদরিয়া ইসলাম

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯) মহামারির প্রভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বেড়েছে। যারা কোভিট-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন তারাই নয় বরং যারা এখনো এই রোগে আক্রান্ত হননি তাদের মাঝেও বেড়েছে মানসিক নানাসমস্যা। একইসঙ্গে যারা কোভিট-১৯ সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাদের মাঝেও দেখা দিচ্ছে নানারকম মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার প্রভাব। এর ফলে সামাজিকভাবেও দেখা যাচ্ছে নানারকম বিশৃঙ্খলা।

সুস্থতা হলো শারীরিক , মানসিক এবং সামাজিকতার ভারসাম্যপূর্ণ মেলবন্ধন । শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতাকেও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন অতি গুরুত্বের সাথে । কিছু কিছু অসুখ যেমন হৃদরোগ , ডায়াবেটিস, শ্বাসতন্ত্রের রোগ এগুলোর পেছনে কখনো কখনো অবসাদ , দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদিকে কারণ হিসেবে ধরা হয় ।মানসিক উদ্বেগ , দুশ্চিন্তা থেকে হতে পারে ডায়াবেটিস , হৃদরোগ, ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী রোগ । এসব কারণে চিকিৎসকরা বলেন সার্বিক সুস্থতার জন্য শারিরীক ও মানসিক রোগের সমন্বিত চিকিৎসা জরুরি । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শরীরের পাশাপাশি মনকে গুরুত্ব দিয়ে মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ অক্টোবরকে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "Mental Health is an Unequal World" .

বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ , ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, প্রিয়জন হারানোসহ নানাক্ষতির কারণে বিভিন্ন সময় মানুষ মানসিক কষ্টে ভোগে । বিভিন্ন কারণে মনের কষ্ট ও দুশ্চিন্তার ফলে অনেক সময় নিয়মিত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে । সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ব্যক্তি আর পারিবারিক জীবনকে দাঁড় করাচ্ছে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি । এসবের জন্য দায়ী মনের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা ।আর এইভাবেই মানসিক সমস্যার সূত্রপাত হয়। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা নিয়েই স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে মানসিক ও সামাজিক সুস্থতাও দরকার। মানসিক সুস্থতা ছাড়া সার্বিক সুস্থতা সম্ভব নয়। মানসিক সুস্থতা হলো মন ও মনন, আবেগ ও আচরণের সুস্থতা। জাতিসংঘ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা তিন নম্বরে –সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের সরকারও এসডিজির এই লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪ -এর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আরেকটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হচ্ছে প্রতিবন্ধিতা। বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচিতে এ দু'টি বিষয়কেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আমরা সবাই চাই সুস্বাস্থ্য বজায় থাকুক । শারীরিক অসুস্থতায় আমরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হই , কিন্তু মানসিক সমস্যাকে আমরা আমলে নেই না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত। অন্যদিকে ১৮ বছরের কম বয়সি শিশু ও কিশোরদের মধ্যে মানসিক রোগে আক্রান্তের হার ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। মনোরোগ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে ফেসবুকসহ সবধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের ৯০ ভাগই ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি তরুণ যাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে সাইবার ব্যুলিং এর ঝুঁকি উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর মূল কারণ হলো বিশ্বায়নের প্রভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রযুক্তি সবখানেই অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ছোঁয়ায় তরুণরা বেশি প্রভাবিত হচ্ছে। আর প্রযুক্তিতে মগ্ন থাকার এই প্রবণতা এক ধরনের আসক্তিতে পরিণত হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারণে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ডাব্লিউএইচও চারটি বিষয়কে বেশি গরুত্ব দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে এক নম্বর হলো সাইবার ব্যুলিং অর্থাৎ ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাউকে বিরক্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, ট্রমাটাইজ করা, কারো কোনো খারাপ ছবি প্রকাশ বা ব্যাঙ্গবিদ্রুপ করা। শারীরিক অসুস্থতা সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটা স্পষ্ট ধারণা কাজ করে । কিন্তু, যখন দেখা যায় আমাদের স্বাভাবিক কাজগুলোও ব্যাহত হচ্ছে, তখনই মানসিক অসুস্থতার প্রসঙ্গ আসে।

শিশু থেকে কিশোর ; কিশোর থেকে তরুণে পরিণত হওয়ার সময় মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। একটি বয়ঃসন্ধিকালীন সংকট তৈরি হয়। সময়টা খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এ জন্য এ সময় মানসিক শুশ্রূষার প্রয়োজন। পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষককে এই দায়িত্ব নিতে হবে। অনেক সময় মনের ভেতর পুষে রাখা কথা বলতে না পেরেও মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় কেউ কেউ। ফলে

নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। মাদকে আকৃষ্ট হয়। এমন একটি ঘটনা এক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়তো সে। হঠাৎ করে এক সেমিস্টারে সে ফল খারাপ করল। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল সন্তানটি মাদকাসক্ত। মা তখন কোনো উপায়ান্তর না পেয়ে সংসার ফেলে রেখে সন্তানকে দেখভাল করা শুরু করলেন।

ততদিনে পরিবারে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। এ পরিস্থিতিতে মা -বাবাকে বুঝতে হবে সন্তানের কী অবস্থা। এজন্যই সন্তানের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিয়ে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে।

মানসিক সমস্যা নানাধরনের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী শারীরক , মানসিক, সামাজিকভাবে ভালো থাকার নামই সুস্বাস্থ্য। তিন ধরনের সমস্যার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । স্নায়ুতন্ত্রের সমস্যা, মানসিক সমস্যা এবং মাদকাসক্তি। মন খারাপ, উদ্বেগ, ভয়- এগুলো স্বাভাবিক আবেগীয় প্রকাশ। দুঃখ বা ব্যর্থতায় যে কারো মন খারাপ হতে পারে । যেকোনো দুঃসংবাদ, উৎকণ্ঠা এবং অন্ধকারের প্রতি ভীতিবোধ ইত্যাদিও অস্বাভাবিক নয় । কিন্তু যখন তা স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে তখনই একে রোগ হিসেবে ধরা হয় । মানসিক রোগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি নিউরোসিস, অন্যটি সাইকোসিস। মূলতঃ বিষণ্নতা, উদ্বেগাধিক্য, অহেতুক ভীতি প্রভৃতি নিউরোসিসের উদাহরণ । অন্যদিকে সাইকোসিস রোগীদের আচার -আচরণ, ব্যবহার-কথাবার্তায় বিশৃঙ্খলতা দেখা যায়। বাস্তবের সাথে তাদের সংযোগ থাকে না। অনেকের মাঝে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন কিন্তু দৃঢ় সন্দেহ দেখা দেয়। তারা সাধারণত নিজেরা বুঝতে পারে না যে তারা রোগাক্রান্ত। আশপাশের মানুষের কাছে তাদের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়।

মানসিক সমস্যায় আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিষ ণ্নতা। সারাবিশ্বে ৩০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ বিষন্নতায় ভোগে। আমাদের দেশেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বিষ ণ্নতায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। গবেষকরা বলেন, বিষণ্নতার কারণে আত্মহত্যার ঝুঁকি থাকে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি ৪০ সেকেন্ডে ১ জন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে আত্মহত্যা করে প্রয় ৮ লাখ মানুষ। তবে আত্মহত্যাজনিত মৃত্যুর অধিকাংশই প্রতিরোধযোগ্য। কিছু নির্দিষ্ট খাবার রয়েছে, যেগুলো মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে। ক্লিনিকাল সহায়তা ছাড়াও, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যায় যারা ভুগছে তারা এই প্রাকৃতিক উপায়গুলো থেকেও মুক্তি পেতে পারে। যেমন-চিয়াসিড এটি ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি দিতে সহায়তা করে; ডিম- এতে উপস্থিত ফলিক অ্যাসিড, বায়োটিন এবং কোলিন মস্তিষ্কের কোষ ও স্নায়ুর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়; দই- গবেষণায় পাওয়া গেছে দই খেলে স্ট্রেস এবং উদ্বেগ কম হয় । এটি সরাসরি ব্যক্তির মুডকে প্রভাবিত করে। ব্রোকলি-এতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম রয়েছে, যা মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বাড়ায় এবং মস্তিষ্ককে সতেজ রাখে; বাদাম- এগুলোতে উচ্চ পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম এবং তামা রয়েছে, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করতে এবং মানসিক অসুস্থতা উপশম করতে সহায়তা করে ইত্যাদি।

সামাজিক অপরাধ শুধু শহরে নয়, গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে ছে ব্যাপক হারে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রমে গ্রামের দিকে সুনজর দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ ডাক্তাররা প্রান্তিক পর্যায়ের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিশাল অপ্রশিক্ষিত গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদেরকে মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দক্ষ পেশাদার করে তৈরি করা অপরিহার্য। সরকারও এক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। গত দুই দশকে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, মসজিদের ইমাম ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে তৃণমূল পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে প্রায় ৫ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী, ৪ হাজার ডাক্তার, ৫০ সিভিল সার্জন ও ২শত ইমাম মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। হাসপাতালের দেওয়া পরামর্শে চিকিৎসার ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো অব্যাহত ফলোআপ সেবা দিতে পারে বলেও মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের কমিউনিটি ক্লিনিক বর্তমানে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচি প্রদানে একটি কার্যকর মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত, যাতে প্রতিরোধমূলক মানসিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মৌলিক সেবা অন্তর্ভুক্ত। এই কমিউনিটি ক্লিনিক মডেল প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবন।

তারুণ্যের আগেই শৈশব বা কৈশোরকাল থেকে এ ধরনের সেবা নিশ্চিত করতে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে খণ্ডকালীন বা স্থায়ী মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী বা বিশেষজ্ঞ রাখার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে।। মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক বৈকল্য বা বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রচারণার জন্য প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলভিত্তিক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এ নিয়ে কাজ করছে সরকার। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ, আইনজীবী, বিচারক, গণমাধ্যমকর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো জরুরি।

মানসিক স্বাস্থ্যকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতি বারবার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত হলো, একই ব্যক্তির মধ্যে দুই বা ততোধিক রোগের উপস্থিতির ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা অন্যান্য রোগ নিরাময়ে সহায়ক হয়। সেই সাথে সার্বজনীন স্বাস্থ্য কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক স্বাস্থ্য ও প্রতিবন্ধিতাকে বাদ রাখা হয়। কিন্তু মানসিক রোগ প্রতিরোধে আমাদের প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী ও দক্ষ সেবাদান ব্যবস্থা থাকা দরকার।

সুস্থ, স্বাভাবিক ও সম্ভাবনাময় জীবন পেতে হলে প্রত্যেক মানুষের কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন । সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত থেকে নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন ব্যক্তিকে নতুন আশায় উজ্জীবিত রাখে , সুখী হতে সাহায্য করে । প্রতিদিন গোসল, নিয়মিত দাঁত ব্রাশ , ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার সাথে সুষম খাবার ও পুষ্টিকর খাবার এবং নিয়মিত ব্যায়াম সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। অনিয়মিত খাবার গ্রহণ যেমন গ্যাসট্রিক -আলসারসহ শারীরিক অসুস্থতার কারণ তেমনি তা মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী হরমোনের নিঃসরণ বাড়ায়। পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহপ্রবণতা, মিথ্যা বলা, অহেতুক হিংসা, কুটিলতা, অন্যায়ভাবে অন্যের ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, পেশাগত জীবনে অনৈতিকতার চর্চা, অধিক বিলাসী জীবনের প্রতি মোহ মনের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে । এটা এক ধরনের ব্যাধি , যা দিনে দিনে বাড়তে থাকে । মনের অজান্তে মানুষ আরো গুরুতর পাপ কাজের দিকে ধাবিত হয়। নিয়তির অমোঘ নিয়মে প্রকৃতির অভিশাপ মানুষকে ধ্বংসের দিকে টানে । নিজের ক্ষতির সাথে সাথে পরিবার সমাজের ক্ষতিও যেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়ায় । তাই মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সচেতনতা খুবই জরুরি । আর মানসিক সুস্বাস্থ্য শারীরিক ও সামাজিক জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

#

০৩.১০.২১ পিআইডি ফিচার